এক কাল-বৈশাখীর ঝড়ে

যুথিকা বড়ুয়া

প্রবাসী জীবনে শত ব্যস্ততা মধ্যেও চৈত্র মাস এলেই দেশের টানে মনটা কেমন আনচান করে ওঠে। মুহূর্তে ছুটে চলে যায়, কৈশোরের আনন্দ-কোলাহল মুখর এবং হাজার মায়া ঘেরা আমাদের সেই কার্ত্তীকপুর গ্রামে। চকিতে প্রতিবিম্বের মতো স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে, দিগন্ত জুড়ে সবুজ ধানক্ষেত, কচুরীপানাভরা পুকুর, খাল-বিল, নালা-নর্দমা এবং ছোট্ট জলাশয়। যেখানে বর্ষার জল জমে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যাঙাচি আর শোলমাছের পোনারা কিলবিল করতো। আমরা সঙ্গী-সাথিরা সবাই দলবেঁধে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে নেমে পড়তাম মাছ ধরতে। কখনো প্রবল ঝড়ের মুখে ছুটে যেতাম, পাড়ার ঝন্টুদের বিশাল আমগাছতলায় কাদায় লেপটে পড়ে থাকা কাঁচা-পাকা আম আর জামরুলের সন্ধানে। কখনো বা আমাদের মাথার ওপরেই টপাটপ ঝড়ে পড়তো। আমরা তখন আনন্দে দিশা হারিয়ে দুইহাতে বুকভরে কুড়োতাম।

ততক্ষণে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসতেন ঝন্টুর মা, উষারানী। তিনি ছিলেন সাংঘাতিক কৃপণ এবং হিংসুটে গোছের মন-মানসিকতা। ওনার গাছের আম কাউকে স্পর্শ করতে দিতেন না। নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তা গ্রাহ্য করতো কে! ওনার অলক্ষ্যে আমরা চুপিচুপি আমবাগানে ঢুকে পড়তাম। কিন্তু টের পেলে আর রক্ষে থাকতো না। তিনি গরুতাড়া করতেন, গালি-গালাজ করতেন। রেগে গিয়ে উত্তপ্ত মেজাজে বলতেন,-"তড়া আইলি ক্যামনে? তগোর ডর-ভয় নাই? গাছের ডাল একখান্ ভাইঙ্গা পড়লেও তো ফাইট্যা যাইব গিয়া তগোর মাথা! কই গেল ঝন্টু! হেইডাই হইল গিয়া যত্তো নষ্টের গোড়া! হতচ্ছাড়া,বেয়াদপ! ছ্যামড়া দলবল আইন্যা উৎপাত করস! কত্তো সাধের আমগুলিরে আমার ধংস করস!"

ঝন্টুই ছিল নাটের গুরু। মায়ের আওয়াজ পেলেই আমাদের ভাগিয়ে দিতো। আজ যেখানে হাই-রাইজ্ বিল্ডিং গজিয়ে উঠে কি নিদারুণ ঝক্‌ঝকে্ তকতকে একটি সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়েছে। সেই শষ্য-শ্যামল গ্রাম্য পরিবেশের চিহ্ন পর্যন্তও নেই! কিন্তু কৈশোরে ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনের অম্লান স্মৃতিগুলিকে কখনো কি ভোলা যায়! কখনো কি ভোলা যায়, প্রবল বর্ষণের ছটায় পদ্মদীঘির শাফলা ফুলের পাঁপড়ি মেলে মনমাতানো নাচনের অবিস্মরণীয় সেই দৃশ্য!
না, ভোলা যায় না! তেমনি কখনোই ভোলা যায় না, সবুজ বিলের মাঝে কচুবনের গা-ঘেষে কয়লার ইঞ্জিনে চলন্ত রেলগাড়ির হৃদয় কাঁপানো জোরালো বাঁশি আর ঝিকঝিক্ শব্দের এক অদ্ভুদ আকর্ষণে যেদিন চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল ঝন্টুর দৃষ্টিশক্তি।

১৯৭৩ সালের কথা। তখন কতই বা আমাদের বয়স! বিবেক-বুদ্ধির বিকাশই ঘটেনি। মুক্ত-বিহঙ্গের মতো বন্ধনহীন, চিন্তাহীন মুক্ত জীবন। কত আনন্দের। ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ বোধ-জ্ঞান তখন কিছুই ছিল না। ঝন্টুই আমাদের ইন্ধন জোগাতো, আমাদের গাইড করতো। রাত পোহালেই ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা পূর্ণোদ্যমে আনন্দ-কোলাহলে মেতে উঠতাম। লুকোচুরি খেলতাম। পশ্চিমপ্রান্তে ক্লান্ত সূর্য্য কখন যে অস্তাচলে ঢলে পড়তো, আমাদের হুঁশই থাকতো না। আমরা খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে ভেসে বেড়াতাম।

বয়সে ঝন্টুই ছিল আমাদের সবার বড়। অথচ নিজে অবাধ্যতা এবং বেপরোয়ার কারণে প্রতিদিন ওর মায়ের বকুনি খেতো। যেমন ছিল অতিরিক্ত চঞ্চল, দুরন্ত তেমনি দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা। লেখাপড়াতেও একেবারে অষ্টরম্ভ। কোনরকমে ভাতদু'টো গোগ্রাসে মুখে দিয়ে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নামমাত্রই স্কুলে ছোটা, ক্লাস করা। তারপর

ওর নাগাল পায় কে! কাঁধের ব্যাগটা আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে মনের সুখে টোটো কোম্পানী করাই ছিল ওর ডেলি রুটিন। আর ছুটিরদিনে সারা পাড়া মাথায় নিয়ে উদয়াস্থ চলতো ওর রাজত্ব। হনুমানের মতো তর তর করে গাছের আগায় উঠে শীশ্ দিয়ে আমাদের সকলকে একত্রিত করে চোর পুলিশ খেলতো। কিন্তু রেলগাড়ির ঝিক্ ঝিক্ শব্দ আর বাঁশি শুনলে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। সবার অলক্ষ্যে ছুটে যেতো কচুবনের ঝাঁড়ে। ছুটতে ছুটতে কাঁটাতারের বিশাল জ্বাল ডিঙ্গিয়ে রেললাইনের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ভাবতো, কোনপ্রকারে রেলগাড়িতে একবার উঠে যেতে পারলেই বহু দূর-দূরান্তে পৌঁছে যেতে পারবে। অনেক দেশ-বিদেশ দেখতে পাবে। কেউ বাঁধা দেবার থাকবে না। মনের সাধ মিটিয়ে রেলগাড়িতে চড়তে পারবে।

তখন ছিল চৈত্র মাস। প্রায় প্রতিদিনই ঝড় উঠত। সেদিনও সকাল থেকে গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। একটু হাওয়া নেই, বাতাস নেই, পশু-পক্ষীর কলোরব নেই। যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীটা। অপরাহ্নেই ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। সেই সঙ্গে তুফানি পবন আর বাতাসের গোঙানী। সে একেবারে প্রলয়ঙ্করী বেগে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। তারপরই শুরু হয় বৃষ্টি। যেন আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি।

ফলে অনিবার্য কারণবশতঃ সেদিন রেলগাড়ি থেমে গিয়েছিল। কি ভয়াবহ সেই দৃশ্য! কূয়াশার মতো ধোঁয়াটে আবরণে চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। রাজ্যের হাঁস-মুরগী, পশু-পাখী থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীই তার নিজের প্রাণ বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছিল। এমতবস্থায় ঝন্টু মরিয়া হয়ে উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে যাচ্ছিল রেলগাড়িতে উঠবে বলে। কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খন্ডাবে কে! হঠাৎ বেকায়দায় পা শ্লীপ্ করে কাদার গভীরে আঁটকে যেতেই ঝন্টু হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁটাতারের ওপর।

সাধারণতঃ বিপদকালেই মানুষ দিশা-জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়, বুদ্ধিভ্রষ্ঠ হয়ে পড়ে। আর ঝন্টু তো নাবালক। তাল সামলাতে পারেনি। চোখদু'টোয় গুরুতরো আঘাতে ঘায়েল হয়ে কখন যে সেন্সলেস হয়ে পড়েছিল, কেউ জানে না। ওদিকে ডেকে ডেকে হয়রান মা উষারানী। চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে ছেলেটা গেল কোথায়?

কিন্তু এ আর নতুন কি! ঝন্টু সাংঘাতিক দুঃসাহসী ছেলে। বিধাতা যে কোণ্ ধাতূ দিয়ে ওকে গড়েছিলেন, ডর ভয় বলতে ওর শরীরে কিচ্ছু ছিল না। বাঘের কলিজা ওর। কি শীতকাল, কি বর্ষাকাল, প্রবল বর্ষণের মধ্যেও সন্ধ্যে সাতটার আগে কোনদিনই ওর টিকি পাওয়া যেতো না। কিন্তু সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে সেই কখন! ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার রাত। ঝন্টু তখনও নিখোঁজ, বেপাত্তা।

ততক্ষণে হৈ চৈ পড়ে যায় সারাপাড়ায়। ভাগ-দৌড় শুরু হয়ে যায়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে ওর মা-বাবা, বড় দাদা, দিদি সবাই। তখনও ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। তা উপেক্ষা করে ছাতা নিয়েই পাড়ার লোকেরা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। সবার মুখে একটাই বুলি,-"ঝন্টুকে দেখেছ কোথাও? ও' কোথায় গেছে তোমরা কেউ জানো? ওকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা!"

একসময় থেমে যায় বৃষ্টি। শিথিল হয়ে আসে প্রকৃতির উন্মাদনা। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জলে থৈ থৈ করছে সারাপাড়া। গ্যাঁঙর গ্যাঁঙর করে ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। ঝন্টু তখনও নিখোঁজ। হাক ডাক দিয়ে ওকে তন্ন তন্ন করে সবাই খুঁজতে থাকে।

সেই সময় এক গোয়ালা পাড়ায় দুধ দিতে আসতো। সেদিন ফিরতি পথে হঠাৎ তারই নজরে পড়ে, কে যেন মুখ থুবড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে রেললাইনের ধারে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কাদাজলে মিশে চারদিক কালো হয়ে গেছে।

খবরটি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সারাপাড়ায়। আর শোনামাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পাড়ার যুবক ছেলেরা। যারা কাঁধে চেপে ঝন্টুকে নিয়ে গিয়েছিল স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানে মাসখানিক চিকিৎসাধীনে থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে ঝন্টু বাড়ি ফিরে এসেছিল ঠিকই কিন্তু চিরতরে হারিয়ে গেল ওর চোখের দৃষ্টি।

সেই তখন থেকেই আমাদের পাড়ায় উৎপাত উপদ্রপ, হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার-চেঁচামিচি সব বন্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল আমাদের আনন্দ-কোলাহল, হাসি-গুঞ্জরণ। কিছুতেই ভাবতে পারতাম না, ঝন্টু অন্ধ, ও' চোখে দেখতে পায় না। সে যে কি যন্ত্রণা বুকে পুষে রেখে কৈশোরের বাকি দিনগুলি আমরা অতিবাহিত করেছিলাম, তা মনে পড়লে চোখে আজও জল আসে।

তারপর কত ঝড়-তুফান এলো আর গেল, ঝন্টুদের আমবাগানে আমরা কেউ আর যেতাম না আম কুড়োতে। গাছের আম গাছতলাতেই পড়ে শুকিয়ে যেতো। কখনো পোঁচে দুর্গন্ধ বের হতো। কেউ পরিস্কার করতো না। আর এভাবে দীর্ঘদিনের **নোংরা আবর্জনায় একসময় গভীর জঙ্গলে পরিণত যায়। যেখানে রাজ্যের সাপ-ব্যাঙ, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় গিয়ে** বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন নদীর প্রবাহ সদা চঞ্চল, বহমান। কখনো থেমে থাকে না। জোয়ার ভাটার টানে কখন কোন্ মোহনার দিকে ধাবিত করে, তা কেউ বলতে পারে না। কালের বিবর্তনে ঝন্টুরা জায়গা জমি বেচে দিয়ে আমাদের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্রে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে। তারপর আর দেখা হয় নি ওর সাথে।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, চোখে কালো চশমা পড়ে ঝন্টু যেদিন হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছিল, সেদিন ছিল ১লা বৈশাখ, ১৩৭৯ সাল। বাংলা নববর্ষ। কি আনন্দ আমাদের! প্রতিটি মুদিদোকানে হালখাতা হচ্ছিল। মাইকে শ্রুতিমধুর বাংলা গান বাজজিল। আমরা বেমালুম ভুলে গেলাম ঝন্টুকে। নতুন জামা-কাপড় পড়ে বাংলা নববর্ষকে স্বাগতম জানাতে আমরা নাচে, গানে, সুর ও ছন্দের তালে তালে মেতে উঠি, বাঙালির আবহমানকালের চিরাচরিত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আনন্দ মেলায়।
কিন্তু দুঃখের দহনে, করুণ রোদনে সেদিন ঝন্টুর মায়ের বুকের পাঁজরখানা কিভাবে যে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, তা একটিবারও আমরা কেউ ভেবে দেখি নি। আমাদের একবারও মনে হয় নি, কিভাবে ঝন্টুর দিন কাটবে, রাত পোহাবে! জীবনের এতখানি দীর্ঘ পথ কিভাবে অতিক্রম করবে! কি হবে ওর ভবিষ্যৎ? কোথায় ওর মঞ্জিল? কি হবে ওর পরিণাম?

ঝন্টু সারাদিন জানালার ধারে উদাস হয়ে বসে থাকতো। নৈঃশব্দে কেউ গিয়ে দাঁড়ালে তার নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসে টের পেয়ে ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্ করে কাঁদতো। দুইহাতে চোখের জল মুছতো আর জিজ্ঞেস করতো,-"কটা বাজে রে? তোরা এখনো খেলতে যাসনি? সূর্য্য কি ডুবে গিয়েছে?"

কিন্তু ওকে যে কোন্ ভূতে পেয়েছিল, জীবনের এতবড় একটা সম্পদ চিরতরে হারিয়েও ওর এতটুকু দুঃখ ছিল না। মন্ত্রের মতো সারাদিন শুধু একটাই বুলি জপতো,-"রেলগাড়িতে আমার আর চড়া হলো না রে! আর চড়াই হলো না আমার রেলগাড়িতে!"

কিন্তু কতদিন! যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেও ঝন্টু কি একই স্বপ্ন দেখতো? নিশ্চয়ই নয়! কারণ যৌবনেই নারী-পুরুষ প্রতিটি মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় সৃষ্টি হয়, একটি কাল্পনিক জগত, একটি নিজস্ব ভুবন। যেখানে অবিরল অবয়ব রূপের মহিমায় মনগড়া কোনো এক স্বপ্নপরী কিংবা পক্ষীরাজের আর্বিভাবে প্রতিটি মানুষের মনের মণিকোঠায় অতি সংগোপনে লালিত হয়, জীবনের পরম কাঙ্খিত স্বপ্ন, কামনা-বাসনা। যার অব্যক্ত আনন্দে শরীর এবং মনকে পুলকিত করে। পুলকে বিকশিত করে। আর তারই প্রভাবে মানুষ কত না আকাশকুসুম ভাবনার জাল বোনে। কতই না রঙ্গিন স্বপ্ন আঁকা শুরু করে তার দু'চোখের কোণে! রচনা করে এক অনবদ্য ভালোবাসার পান্ডুলিপি। যখন জীবনের একান্ত চাওয়া পাওয়াকেই সবচে' বেশী গুরুত্ব দেয় পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতি।

কিন্তু ঝন্টুর বেলায় তা হয়ত সম্ভব হয় নি। আর হলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। কিংবা আদৌ ওর ভাবান্তর হয় নি। হয়ত দৃষ্টিহীনতার গ্লানিতেই ওর হৃদয়পটে এঁকে রাখা রঙ্গিন স্বপ্নগুলি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। কিংবা ওর গহীন অন্ধকার এবং অনিশ্চিত জীবনে চলার পথে সহযাত্রী হয়ে কোনো এক মায়াবিনি বিদূষী নারী সহমর্মিতা হয়ে ওকে আলোর পথ দেখাতে স্বেচ্ছায় ওর হৃদয়দ্বারে এসে ধরা দিয়েছে, তা কে জানে!

তবে যাই হোক, বাংলা নববর্ষের শুভারম্ভে ঝন্টু সহ আমার ভাই-বন্ধু-স্বজন যে যেখানে আছে সকলকে জানাই আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। সবাই ভালো থাকুক। সুস্থ্য থাকুক। সুখ সমৃদ্ধি হোক। জীবনে বয়ে আসুক আনন্দ।

যুথিকা বড়ুয়া : টরোন্ট প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী ।
jbarua1126@gmail.com